কৌশিক চক্রবর্তীর প্রবন্ধমালা

কবিতার রূপ কবিতার অরূপ - ৩

ফিরে আসার রাস্তা

কবিতার জন্ম আছে, পুনর্জন্মও আছে। মৃত্যু নেই। আছে শুধু কিছু হারিয়ে যাওয়ার গল্প। লিখতে এসে তীব্র রক্তক্ষরণে দিন রাত একাকার করে দেওয়ার পর, জানি না কোন এক অভিমানে কেউ কেউ শব্দের পৃথিবী থেকে দূরে চলে যান। এই দূরত্ব কি শুধুই লেখার খেলা থেকে, নাকি পরে এক মেঘকরা দুপুরবেলার মনখারাপে কখনও সখনও কবিতার স্বপ্ন তারা পায় তবু? তাদের মুঠোর রুমাল থেকে কি আয়নাভর্তি প্রজাপতি উড়ে যায় কখনও সখনও? এই সব গল্প, এই সব প্রশ্ন খাতা খুলে বসল একটা বইয়ের হাত ধরে – বাংলা কবিতা : রমেন্দ্রকুমার থেকে প্রবুদ্ধসুন্দর। এই বইয়ের সম্পাদক জমিল সৈয়দ। যিনি "নীলক্ষুর চন্দ্রযান" নামের এক আশ্চর্য বইয়ে লিখেছিলেন:

"এমন কুস্বপ্নে ভরা রাত ! নদীতে ভাসাতে চলেছি ঝুড়ি – / ভেতরে শায়িত কড়ে আঙুলের মতো ছোটো শিশু – / ঘৃণায় কুঁকড়ে চিৎকার করে শাপ দিচ্ছে – বন্ধ্যা হ', বন্ধ্যা হ'" [পারদ]

অথবা

"আমার হাতের ঘড়ি – কামিনীগাছের নিচে পড়ে/ রাত্রি দুটোকে ধরে ঘুমোয় এখনও ! " [রাত্রি দুটো]

অথচ সেই তিনিও বাংলা কবিতার থেকে দূরেই চলে গেলেন। তাঁর সম্পাদনায় 'এ মাসের কবিতা' পত্রিকা থেকে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এ বই। যেখানে ধরা আছে রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী (জ. ১৯২২) থেকে শুরু করে প্রবুদ্ধসুন্দর কর (জ. ১৯৬৯) পর্যন্ত আঠাশজন কবির কবিতাসম্ভার। কিন্তু সেই তালিকার চেয়েও আরও বড় এক কবিতা ইতিহাসলিপি আঁকা আছে এই বইয়ে। তার সূচিপত্রে চোখ বোলালে এমন কয়েকজন কবির সন্ধান আমরা পাই, যারা নিজেরাও সম্পাদকের মতনই কবিতা লেখার পাশাপাশি একদিন লিখে ফেলেছেন সেই হারিয়ে যাওয়ার গল্প। তাদের প্রজাপতির ডানাতেও ধুলো পড়েছে। এই বইয়ে পড়ে আছে সেই প্রজাপতিদের মাটিতে নামানো পালক। এ বই তাই এক অর্থে নিরুদ্দেশের আয়নামহল।

কবিতা থেকে তাহলে একজন মানুষ হারিয়ে যায় কেন? তা কি এই কারণেই যে, কবিতা শেষমেশ এক চূড়ান্ত মিথ্যেকথা ছাড়া আর কিছু নয়? তার স্বপ্ন, তার জল, তার সমস্ত রক্তমাংস দিয়ে কবি কি তবে আসলে কোথাও না কোথাও এক 'অপর' নিজেকে লালন করে? কে না জানে ক্যালেণ্ডার পৃষ্ঠাগুলো নিয়ে তার সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক। আর তাই, বুঝি বা আহত আক্রোশে অভিশাপ দিয়ে যায় ক্লান্তি রাক্ষস। খোয়াবে তাদের বিষাদগুলি অন্যমনে কখন যে তারা হয়ে যায়। তাই যেমন করে গাইছে আকাশ, তেমনি করেই এই বইয়ের ভূমিকায় সম্পাদক গেয়ে ওঠেন: "কবি তো তিনিই, যার তীক্ষ্ণ স্পর্শকাতরতা তাঁকে এমন এক জগৎ- এর সন্ধান

পাইয়ে দিচ্ছে যা আলোকবাহিত, যা স্বপ্নবাহিত, যা হাওয়া ও মরুৎ- এর ফুৎকারে অস্থির। ভাবি কে সেই প্রণম্য কবি, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন মৎস্যকন্যা, ইউনিকর্ন, বা স্বর্ণমারীচ। তিনিই তো সেই কবি, যিনি এখনও আবিষ্কার করেন 'চাঁদের চাকার দাগ', যিনি আবিষ্কার করেন 'পরীকুকুর'।"

সেই চাঁদের চাকার দাগ লেগেই কেউ কেউ হারিয়ে যায়। হয়ত বা কোনো এক বিপন্ন বিস্ময় খেলা করে সেখানে। যেমন এই বইয়ের এক কবিতায় কোন এক অন্তরালে চলে যাওয়া কবি হীরক ভট্টাচার্য লেখেন:

"সমস্ত আর্তনাদ, মর্ষকাম থামিয়ে কিই বা করার আছে রক্তের দানা বেঁধে যাওয়া ছাড়া? গোমেদ রঙ পোকার ঝাঁক চামড়ার আচ্ছাদন ফাটিয়ে চুঁইয়ে বাইরে ছিটকে পড়লো। ধীরে ধীরে ভরে ওঠে ডেকচেয়ার, পালংক, ঘরের দেওয়াল, ছাদ... পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া তারাদের আকাশ – ক্লান্ত, কালো, চটচটে, কটু গন্ধ, ঘষা, ছাইমাখা..." [এলিজি]

এই সংকলনের আরেক নিরুদ্দেশপ্রেমিক কবি ভাস্কর মিত্র কিন্তু আবার এই বিপন্ন বিস্ময় বা চলমানতার কাছে তাঁর বর্ণমালা- দোষে ফতুর হওয়ার জলছাপ তুলে রাখেন অন্য এক অনুভবে:

"কবিতাই যুব, আকাশ সঙ্গীত, মেয়েদের নীলচোখ/ থেকে যে জল ঝরছে তারা, তারার শিশির, থিসিল/ ঝোপে নীল রাতে লার্ক ডাকবে সেখানে বসন্ত/ জানিস্ বিজন।/ চললাম নিয়ে আমার আকাশ/ মাঠে কোন সঙ্গী নেই, / কেউ ফুটবল খেলে না, নেট/ নেই এত ধূ- ধূ বিজন আমার কান্নার জল নীহারকুচিরা/ রোজ রাতে ঘাসে পড়ে... এসে..." [নাগরদোলা]

আর রঞ্জন সরকার যখন লেখেন:

"কতদিন আগে মেয়েটির চোখে জল, কাল ভোরে চলে যাবে ঘর ছেড়ে/ নাহার কাটিয়া। ...দূরের সড়ক ঘুরে পথ গ্যাছে, বাস যাবে/ তারপর সংবাদ নেই/ মৃত ছেলেটির দেহ পাওয়া যায় পাটের পুকুরে, ভোর বেলা/ সেই সাক্ষী জল ও নুনের, তারপর সংবাদ নেই" [শিখা]

তখন পাঠকও তার হারিয়ে যাওয়ার রানওয়ে জুড়ে দেখতে পায় পড়ে আছে শুধু কেউ নেই শূণ্যতা। আকাশে তখন থমকিয়ে আছে মেঘ। মনে করে তার আবহমণ্ডলে মাখা আছে কেবল বেদনাবিধুর রাডারের অলসতা আর কিঞ্চিৎ সুখী পাখিদের সংবেগ। যে কিনা এই কিছুক্ষণ আগেও জানতো – এমন বিশাল বন্দরে বহুকাল থামেনি আকাশবিহারী বিমানযান আর তাছাড়া তখন এখানে ওখানে আগাছার জঞ্জাল, তার শূণ্য ডানায় এবার যেন বা তন্ময় মৈত্র- র কয়েকটা লাইন এনে দেয় গতিবেগহীন হাওয়াবাতাসের অরণ্য:

"আমাদের মেট্রোপলিসকে পাহারা দেয় একটা ঘোড়া, ওই/ কালো ঘোড়া সারা রাত পাড় ঘেঁষে ছুটে বেড়ায়... ল্যাম্পপোস্টের/ ছায়া আর আলো জলের ওপর ত্যার্ছা হয়ে ছড়িয়ে থাকে।/ এ কেমন শহর, যাকে ডেক থেকে একদমই চেনা যায় না?/ নির্জন রাস্তা দিয়ে আমি তো অনায়াসেই হেঁটে যাবো গন্তব্যে –" [কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট]

এই বইয়ের ভূমিকায় যখন আমরা পড়ে নিই: "স্বপ্নের ঢেউয়ের বিপুল উত্থানের ভেতর দিয়ে অবিরল সমুদ্রযাত্রাকে কবিতা শুরুর সঙ্গে আজ তুলনা করা যাক; যখন একদিন কল্পনার রত্নজাহাজ ফিরে আসবে আমাদের কাছেই ! মানুষের জীবনযাপন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কি সব সময়ই সোজা সরল পথে চলে? যে জীবনযাপনে আমরা ক্লিষ্ট ও দষ্ট, তার সঙ্গে আমাদের কল্পনারেখার নিঃসীম দূরত্বেরই অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে কবিতা ! প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমমুক্তি পেতে চেয়ে যে স্বপ্নের ও কবিতার দ্বারস্থ হয়েছি, তার সঙ্গে ওই স্থূল, অনভিপ্রেত পৃথিবীর কোনো ঋণসম্পর্ক নেই... "

তখন আরও একবার ভাবতে ইচ্ছে হয় – অবচেতনার এই গহন কি তবে কোনো রাক্ষস ? নাকি নান্দনিকতা ; বৌদ্ধিক বিচারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এক স্বতন্ত্র সত্ত্বা? সচেতন চিন্তায় তার বোধ যখন দিশাহীন, বিপর্যস্ত – তখনই কি একমাত্র তার দাঁত নখ বেরিয়ে আসে ? নাকে এসে লাগে রক্তের গন্ধ ? সেই সময়ে তাকে যত দাবিয়ে রাখতে চাও – সে কি ততই আরও অস্থির হয়? যত তার সামনে ছায়াপথগুলো ক্রমশ মুখোশহীন, ততই কি তার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে ? আর সেই ভয়ে সে কি ততই তার বিষকালো নিঃশ্বাস, ক্রোধ উগরে দিয়ে আরও নিঃস্ব হতে চায় ? যে সময়ে তার রাত্রি এসে মিশে যায় দিনের পারাবারে ... সেখানেই কি কখনও কখনও দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে? তার আর তোমার এখন হয়ত কোনও অসুখ নেই। রাত জেগে সে আর আশ্চর্যের ঠুংঠাং শুনতে পায় না। আর ধরা দেয় না ছেলেদের চোখে গান গাওয়া বুনোগুল্মের ঈশারা, মেয়েদের গায়ের কল্মিফুল আর কস্তুরীর গন্ধ। তাদের সন্ধান পেতে অরণ্যে অরণ্যে দ্বীপে দ্বীপে পাহাড়ি গুহায় রাস্তা হারানো ঘোর লাগা কত কত পর্যটক, কত কত অন্ধ ও বৃদ্ধ নাবিক আর সারেং – তাদের স্বপ্নে বারবার সেই ছমছমে বাঁশির শব্দ ভেসে আসে – পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে তারা পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন – এই সব রহস্যের রং তাই অন্ধকার বলে মনে হয়।

ভূমিকায় সম্পাদক আরও লেখেন: "দৃশ্যের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অলৌকিকতা যখন নিঃশব্দে জেগে ওঠে, তখন বাস্তব ও কল্পনার মাঝখানে কোনো সীমারেখা থাকে না। রুক্ষ পৃথিবীর ধ্যাবড়া সত্যগুলো কী- ই বা কাজে লাগে কবিতার ; বরং বিশ্বাস স্থাপনের বহু দূরবর্তী এই কবিতা... খরপৃথিবীর পৃথুল গোলগাল আয়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়। দেখার ক্ষমতা কত সুদূর ও বিস্তৃত হতে পারে, আর এই অলীক- দর্শন প্রায় ভৌতিক, নাকি ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে কবির কাছে। "

আর হয়ত তাই কবি অনুপ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় এক ঘন রাতের ছায়া পড়ে। তার গাঢ় ঘুম থেকে উঠে বারবার ঘোরে ফেরে প্রাইমর্ডিয়াল আর্কেটাইপের ছায়াশরীর। সেইসব শব্দ এক মৃত্যুর গন্ধ ছড়ায়। যে গন্ধ একদিন কবিতার জগৎ থেকে ছুটি নেওয়ার চিঠি হয়ে উড়ে আসে:

"যেই রাত হলো, রাতে খুব ঝড়জল, শূণ্য থেকে ঝরে পড়া হলুদ ফোঁটার গল্প, বাতির মসৃণ বেয়ে কিছুটা এসেই, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে রুপোঝুরি ঘাগরা ফাঁসায়। আর ঠিক এর ফাঁকে কখন সাপিনী তার দক্ষিণী তাঁতের খোলস অল্প খসিয়ে হাসে নীলাদি'র হাসি... হাসলে দাঁতের ফাঁকে রক্তের ছিটে..."

[যাপন]

বাস্তব ও কল্পনার সীমারেখা পেরোনো এই কথোপকথন উঁকি দেয় বিবেক চট্টোপাধ্যায়ের নির্বাসন- কামনায়:

“বিকেল ৫- ৩৫ মিনিটে কমলালেবুকে একটিপে ছুঁড়ে দিতেই, হাঁ- মুখ থেকে বেরিয়ে এল বিকলাঙ্গ ব্যাঙ। এরপর আরাম। গায়েতে জ্বর নেই। বিছুটির ওপর মলম নিজেই মালিশ করেছে গোলডায়াল। এই স্বপন সত্যি বলতেই দেওয়াল থেকে লেজের ঝাপটানি। ক্রমশ রাগে ফুলে ওঠে অতিকায় কালো শরীর, কি করে যেন ধরা পড়েছে ব্যাপারীদের জালে। জাল তো নয় লোহার গরাদ, ভেঙে পালাতে কি পারবে তুমি আজ?” [সময় – ১]

এই স্বপ্ন, এই কল্পনা, এই খয়েরি বাস্তব আসলে কবিরই আত্মরক্ষা, অজ্ঞাতবাস ও অন্যান্য বিপন্নতার অংশ। আত্মগোপনকারী কবিই ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছড়ায় ফসলবীজে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। সে টের পায়, আজ অনেকদিন হয়ে গেল, তার কবিতা আসলে ধারাবাহিক এক আত্মহত্যার বিবরণী ছাড়া কিছু নয়। কারণ আত্মহননই সবচাইতে সমর্থনযোগ্য পরিত্রাণ। সে খুঁজতে চেষ্টা করে গোপন সুড়ঙ্গের নক্‌শা... কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম আর জন্মগত জড়ুলচিহ্ন ছাড়া আর কিচ্ছু পায় না... ভুলভুলাইয়ার পরিখায় পালাতে চায় তাই... আর এভাবেই নিজেদের থেকে নিজেরাই পালাতে পালাতে খোলসে ঢুকে পড়ে – প্রজাপতি হবে বলে।

এই প্রজাপতির কলন লেখেন কবি রণজয় চট্টোপাধ্যায়:

“ঘরের মেঝেতে জবার বাগান ভোরের দিকটা ঘুমিয়ে পড়লে/ বাগান ক্যামন ডানা মে’লে দিলো অদ্ভুত কিছু শিশির পড়েছে/ কাল রাত্তিরে পরী এসেছিলো ‘বলো না মা দাদা কোথায়/ পরীরা কালকে দাদাকে চুরি করে নিয়ে আকাশে পালালো আমাকে নেবে না ” [কল্পবিজ্ঞান কাহিনি]

লেখেন কবি চিত্রভানু সরকার:

“আমার স্বভাব একটু আলাদা, আজো শীতের পোশাক কুলে ছুটে যাই মাঠে, প্রত্যেকটি কবরের বুকে জ্বেলে দিই শান্ত মোমবাতি। যখন বাড়ি ফেরার জন্য ফিরে দাঁড়াই, দেখি একটি আলো খণ্ড, আকাশের সব থেকে নিম্নরেখার কাছে অপেক্ষায় আছে। ” [যান]

ভাঙা এ অক্ষরগুলো জোড়াতালি দিয়ে দিয়ে প্রজাপতির ডানা চেনায়। পুরোনো হ্যাজাকের আলোয় হাটফেরতা ফরিশ্‌তারা চাঁদ দেখে। তবু ঘুমের দরজা ঠেলে কেউ কেউ ফেরে না। যেমন এখনও ফেরেননি এই ন- জন কবি।

তবু সেই সংখ্যাটা শুধু ‘নয়’ বলেই, কবিতার দশদিক জুড়ে বুঝি বা এখনও নামেনি স্মৃতি বিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি কোনো অন্ধকার। তাই পৃথিবীর কবিতায়, বাংলা ভাষার কবিতায় নির্বাসনে বা নিরুদ্দেশে চলে যাওয়া কবির সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনই দীর্ঘ অনুপস্থিতির পরও ফিরে আসার উদাহরণও কম নয়। এঁদের কেউ কেউ যেমন চিরকালের জন্যেই যাযাবর হয়ে বেরিয়ে পড়েন, তেমনই গোপন বাঙ্কারে বসে এদেরই মধ্যে কেউ কেউ জেগেও ওঠেন। দীর্ঘ এক শীতঘুমের পরে সে কারনেই আবার লেখায় ফেরেন উৎপল দে। হারাতে হারাতে একা হয়ে গিয়েও ফিরে আসেন আবীর সিংহ, মানসকুমার চিনি। তাদের প্রত্যাবর্তনের পথে পড়ে সাদাকালো আলোর খোশবাই। নব্বইয়ের আরেক কবি দেবরাজ চ্যাটার্জি দীর্ঘ নিরুদ্দেশের পরে আবার ফিরে আসার দরজায়। ইতিমধ্যেই হাতে হাতে ফেরা তার নতুন বই “কলকাতা ২০/২০”- র পাণ্ডুলিপিতে জেগে উঠছে ফিরে আসার

চিয়ার্স। ঠিক এই মুহূর্তে, হয়ত বা দেবরাজের মতন, মানসকুমারের মতন আরও অনেকেই একা ও গোপনে বেরিয়ে পড়েছেন খোলা রাস্তায়। তাঁদের ফিরে আসাটুকু শুধু সময়ের অপেক্ষা।

একটা প্রায় অমর হয়ে যাওয়া কবিতা পংক্তি আছে আবীর সিংহ- র। বন্ধুর মৃত্যু নেই, পুনর্জন্ম আছে। অনেকদিন পর আজ অনুভব করছি - এই কবিতা আসলে "কবিতা"- কে নিয়েই লেখা। কবিতারও মৃত্যু নেই। শুধু পুনর্বার জন্মানো আছে।

আর যদিও বা সাময়িক কিছু হারিয়ে যাওয়া থেকে থাকে, তার ফিরে আসার রাস্তাটি আজীবন খোলা... বাড়ি ফেরার জন্যে কেউ না কেউ সেখানে ঠিকই দাঁড়িয়ে ...